বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তায় নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন

শান্তা পত্রনবীশ*

Abstract: Bangabandhu embodied the truth of equality between men and women in his philosophy. This fact is reflected through Bangabandhu's autobiography, various speeches and statements and his thoughts on women development and empowerment are revealed. Bangabandhu was aware of how the system of confinement, dowry system, child marriage, polygamy, illiteracy, superstition, religious practices etc. made women's lives miserable. Bangabandhu identified multifaceted problems in the path of women's progress and tried to solve them. He gave importance to the role of women in building a prosperous and self-reliant Bangladesh. He was also respectful of women in his personal and family life. Bangabandhu's respect for women, life-philosophy of equality between men and women, above all, Bangabandhu's far-reaching and progressive thoughts on women's development were the foundation of women's development and empowerment in post-independence Bangladesh. The theme of the present article is to uncover and evaluate the nature of Bangabandhu's thoughts on women's development and empowerment through his autobiography, speeches and statements and the various steps taken by him for women's development.

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণির করে রাখার মানসিকতা, ধর্মীয় অনুশাসন, ধর্মের অপব্যাখ্যা, কুসংস্কার যে নারীর উন্নয়নে বাধাস্বরূপ তা বঙ্গবন্ধু প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নারীকে পর্দার নামে ঘরে বন্দি করে রাখলে কোনো জাতি যে অগ্রসর হতে পারে না–তা বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বাঙালি নারীদের বিয়েতে প্রচলিত যৌতুক প্রথার কঠোর সমালোচক ছিলেন। বঙ্গবন্ধু মনে করতেন নারী জীবনের আর একটি বড় সমস্যা পুরুষের বহুবিবাহ। তাঁর মতে নারীর উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো শিক্ষা। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকেও বঙ্গবন্ধু আন্তরিকতার সঙ্গে মূল্যায়ন করেছেন। তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর সকল ধরনের ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পক্ষপাতি ছিলেন। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন, একজন নারী যদি অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হয় তবে সংসারে তার মতামত দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি সমাজেও নারীর অবস্থান সুদৃঢ় হবে। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে তার এমন চিন্তাধারারই প্রতিফলন দেখা যায়। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে শত প্রতিকূলতার মাঝেও বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ পরবর্তী নারী পুনর্বাসনসহ এদেশের নারী সমাজের উন্নয়ন, নারী শিক্ষার বিস্তার, নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নারীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় রচিত বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানের বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে নারীর অধিকারের কথা বলা হয়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদগুলোতে নারীর উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা লক্ষ করা যায়। এছাড়া প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। নারী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর ভাবনার অনেকটাই প্রকাশিত হয়েছে এই পরিকল্পনায়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইনসহ নারী বান্ধব বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের নারী সমাজকে বৈশ্বিক নারী উন্নয়ন আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করেছিলেন।

প্রবন্ধের শুরুতেই নারী উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে সাধারণ আলোকপাত করা প্রয়োজন। সার্বিক বিবেচনায় নারী উন্নয়ন মূলত মানব সম্পদ উন্নয়নেরই একটি অংশবিশেষ যেখানে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কেবল নারীর উন্নয়নকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় রাখা হয়ে থাকে। নারী উন্নয়ন মানেই নারীর প্রাপ্য যৌক্তিক ও ন্যায়সংগত সুযোগ সুবিধায় প্রাপ্য যুক্তিযুক্ত ও নায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সার্বিক নিরাপত্তা বিধান। (সিরাজুল করিম, ২০১২ : ৯) উন্নয়নের সাথে নারীকে সম্পৃক্তকরণের প্রশ্নটি সামনে রেখে তিনটি পৃথক তাত্ত্বিক ধারার উদ্ভব ঘটেছে।

ক. উন্নয়নে নারী (Women in Development বা WID)
খ. নারী ও উন্নয়ন (Women and Development বা WAD)
গ. জেন্ডার ও উন্নয়ন (Gender and Development বা GAD)

WID সমর্থনকারী তাত্ত্বিকেরা নারীকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করে নারীকে নিজস্ব ভূমিকা পালনের সুযোগ করে দেওয়া এবং এর মধ্য দিয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে। WAD মনে করে, নারী সব সময়ই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশ। কাজেই তাদেরকে নতুন করে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি অবান্তর। এক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে নারীর সম্পর্কের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে নারীর প্রাপ্য কতটুকু এটাই এই তত্ত্বের প্রধান বিবেচ্য। GAD পদ্ধতি জেন্ডার সম্পর্কের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। এই মতানুসারী তাত্ত্বিকেরা নারীকে উন্নয়ন সহায়তার নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা নয় বরং পরিবর্তনের বাহন ও উন্নয়নে ভূমিকাধারী হিসেবে দেখেন। এ ধারার তাত্ত্বিকেরা নারীমুক্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবা প্রদানে রাষ্ট্রের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তবে সার্বিকভাবে বলা হয়ে থাকে নারীর উন্নয়ন নিশ্চিত করবে সমাজ ও রাষ্ট্র। সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা আর সার্বিক নিরাপত্তা বিধানই একজন নারীকে মানব সম্পদে পরিণত করবে উৎপাদন অর্থনীতির অত্যাবশ্যক চাকাকে গতিশীল করার লক্ষ্যে। কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় মানব সম্পদে একজন নারী তার শারীরিক-মানসিক শ্রম ও মেধার বিনিয়োগে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। তাই নারীর উন্নয়ন নির্ভরশীল সেই নারীর সংশ্লিষ্ট পরিবার-সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কর্তৃক কাঙ্ক্ষিত অধিকার প্রতিষ্ঠা আর ব্যক্তিগত ও কর্মক্ষেত্রের উপযুক্ত নিরাপত্তা বিধানের ওপর। (সিরাজুল করিম, ২০১২ : ৯)

ক্ষমতায়ন হলো বস্তুগত, মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ওপর ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। (তপতী সাহা, ১৪০৯ : ১৪২) ক্ষমতায়ন হচ্ছে মানুষের সেই অধিকার অর্জিত হওয়া যার দ্বারা নিজের জীবনের পাশাপাশি সমাজ-পরিপার্শ্বের ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব হয়। ক্ষমতার সঙ্গে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার অর্জিত হওয়া অর্থাৎ ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি বিষয় যার দ্বারা মানুষ তার নিজের শরীর, মন ও কাজের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। (রোকেয়া কবীর, ২০০৩ : ১৫১) নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূচক ব্যবহৃত হয়। যার মধ্যে রয়েছে সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের ক্ষমতা, সম্পদ অর্জনের ক্ষমতা, পরিবারের অর্থ লেনদেনে সম্পৃক্ততা, আত্মোপলব্ধি ও অবলোকন, আইনের

আশ্রয় নেওয়ার ক্ষমতা, নিজের পারিপার্শ্বিকতা পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, প্রজনন বা জন্মনিয়ন্ত্রণে নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়া ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা, বিচরণের গণ্ডির প্রসারতা ইত্যাদি। (সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পা), ২০০৩ : ৮৩-৮৭) নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন পরস্পর সম্পৃক্ত। নারী উন্নয়নের নীতি-পদ্ধতিসমূহের মধ্যে চূড়ান্ত পদ্ধতি হলো ক্ষমতায়ন পদ্ধতি।

পরিবার থেকে রাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধু নারীর নিরাপত্তা বিধান তথা অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার ছিলেন। প্রান্তিক নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ থেকে তা প্রতীয়মান হয়। নারী উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নে বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী এবং প্রগতিশীল ভাবনা এবং এক্ষেত্রে তার গৃহীত পদক্ষেপ এবং অবদান সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক গবেষণা করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রধানত এটি তথ্য অনুসন্ধানমূলক গবেষণা। এই গবেষণায় বিবরণ এবং বিশ্লেষণ দুইই স্থান পেয়েছে। এই গবেষণা কাজে প্রাথমিক (আত্মজীবনী, ভাষণ, সংবিধান, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রাতিষ্ঠানিক ওয়েবসাইট, দৈনিক এবং অনলাইন পত্রিকার প্রতিবেদন) ও দ্বৈতীয়িক (প্রবন্ধ, গ্রন্থ) উভয় প্রকার উৎসই ব্যবহার করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর ওপর ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে সহস্রাধিক বই। সম্পন্ন হয়েছে উচ্চতর ও প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা, রয়েছে জীবনী, সাহিত্য, স্মৃতিচারণ, শিশুতোষ এবং নানাবিধ রচনা। তবে এটিও সত্য যে বঙ্গবন্ধুর জীবন এবং কর্মের নানাবিধ বিষয়ের উপর গবেষণামূলক এবং বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থের অপ্রতুলতা রয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর কোনো কোনোটি থেকে নারী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা ও গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও নারী উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নে বঙ্গবন্ধুর ভাবনার সামগ্রিক চিত্র দুর্লভ। এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য বিষয়ে গবেষণার সুযোগ বিদ্যমান থাকায় এই প্রবন্ধ রচনার প্রয়াস পেয়েছি।

প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধুর নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন ভাবনা কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রকাশিত হয়েছিল, বিষয়টি তেমন নয়। বরং এর পূর্বেই পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন পর্বে আলোচ্য বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর সুনির্দিষ্ট অবস্থান চিহ্নিত করা যায়। সেই কারণে বর্তমান প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুর নারী উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন ভাবনাকে প্রধানত দু-টি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

১. স্বাধীনতাপূর্ব নারী উন্নয়ন ভাবনা
২. স্বাধীনতাত্তোর নারী উন্নয়ন ভাবনা

১. স্বাধীনতাপূর্ব নারী উন্নয়ন ভাবনা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী ও পুরুষের সমকক্ষতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তার রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই এই দেশের নারীর অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে চিন্তিত ছিলেন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকথা, বিভিন্ন ভাষণ ও বিবৃতির মাধ্যমে বোঝা যায় নারীকে তিনি বিচ্ছিন্নভাবে দেখেননি, সমাজের অন্যতম প্রধান শ্রেণি হিসেবে দেখেছেন।

ক. বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় নারীর বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা এবং প্রতিকার

যুগ যুগ ধরে অবরোধ প্রথা, যৌতুক প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মীয় অনুশাসন প্রভৃতি বিষয় কিভাবে নারী জীবনকে দুঃবিষহ করে তোলে সেই সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি মনে করতেন পর্দার নামে নারীকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

> আমাদের দেশে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত কিছু সংখ্যক মোল্লা পর্দা পর্দা করে জান পেরেশান করে দেয়। কোনো পরপুরুষ যেন মুখ না দেখে। দেখলে আর বেহেশতে যাওয়া হবে না। হাবিয়া দোজখের মধ্যে পুড়ে মরবে। আমার দেশের সরলপ্রাণ গরিব অশিক্ষিত জনসাধারণ তাদের কথা বিশ্বাস করে আর বেহেশতের আশায় পীর সাহেবদের পকেটে টাকা গুঁজে দেয়, আর তাদের কথা কোরআন হাদিসের কথা বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু ইসলামিক ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে, মুসলমান মেয়েরা পুরুষদের সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেত, অস্ত্র এগিয়ে দিতো। আহতদের সেবা শুশ্রষা করতো। হজরত রাসুলে করিমের (সা.) স্ত্রী হজরত আয়েশা সিদ্দিকা নিজে বক্তৃতা করতেন, 'দুনিয়ায় ইসলামই নারীর অধিকার দিয়াছে। (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০২০: ৯৯-১০)

বঙ্গবন্ধু বাঙালি নারীদের বিয়েতে প্রচলিত যৌতুক প্রথার কঠোর সমালোচক ছিলেন। যৌতুক প্রথাকে একটি ঘৃণ্য ব্যাধি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তিনি। যৌতুক প্রথা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

> কোনো ছেলে লেখাপড়া শিখলে, একটু ভালো চাকরি পেলেই ভাবে যে, বিবাহ করে বেশ কিছু টাকা ও গহনা এবং খাটপালঙ্ক পাওয়া যাবে। মেয়ে মনমতো হলেই শুধু চলবে না, সম্ভব হলে বাড়ি, না হয় গাড়ি, না হয় নগদ টাকা যৌতুক চাই। গরিব ভদ্রলোক মেয়েকে কিছু লেখাপড়া শিখাইয়াছে এখন আবার টাকার দরকার বিবাহ দিতে। কোথায় টাকা পাবে? বাড়ি থাকলে বিক্রি করতে পারতো, তা নাই। নগদ টাকা নাই, বাধ্য হয়ে বলতে হয় কী করবো? কিছুই আমার দেবার নাই। তখন আর মেয়ের বিবাহ হবে না। মেয়ের বিবাহ না হলে সমাজ ঘৃণা করবে, তখন সেই মেয়ের আর কী উপায় থাকে? আস্তে আস্তে আমাদের সমাজে এই ঘৃণ্য ব্যাধিটা ঢুকে পড়েছে। (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০২০ : ৯৭)

বঙ্গবন্ধু যৌতুক প্রথা রুখে দিতে নারীদের এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে বলেছেন, পাশাপাশি আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন হতে অনুপ্রাণিত করেছেন। নারীদের পারিবারিক জীবনে সম্মানজনক অবস্থানে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করতে বঙ্গবন্ধু আরও বলেছেন, যৌতুক একটি মানবসৃষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফল এবং এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন প্রয়োজন। যৌতুক প্রথা বন্ধ করতে নারীদের প্রতি তার আহ্বান:

> আমি আমার দেশের মেয়েদের অনুরোধ করবো, যে ছেলে এইভাবে অর্থ চাইবে তাকে কোনো মেয়েরই বিবাহ করা উচিত না। সময় থাকতে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করা উচিত এবং আমাদের দেশের শিক্ষিত মেয়েদের এগিয়ে আসা উচিত। মানবসৃষ্ট এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলজনিত কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে আমাদের মতো বহু যুবকের সাহায্যও তারা পাবে।" (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০২০ : ৯৭)

বঙ্গবন্ধু এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইনের দায় ছাড়াও মানবিক ব্যবহারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

বঙ্গবন্ধু মনে করতেন, নারী জীবনের আরেকটি বড়ো সমস্যা পুরুষের বহুবিবাহ। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েই বহুবিবাহ প্রচলিত। ইসলাম ধর্মে চার বিয়ে অনুমোদিত। কোনো সামাজিক বাধাও ছিল না। এই বিষয়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

> আমাদের দেশে অনেকে চার বিবাহ করে। পুরুষ যদি চার বিবাহ করে তবে মেয়েরা অন্যায় করেছে কি? কোরআনে একথা কোথাও নাই যে, চার বিবাহ করো। কোরাআন মজিদে লেখা আছে যে, এক বিবাহ করো। তবে তুমি দুই বা তিন বা চারটা পর্যন্ত বিবাহ করতে পারো যদি সকল স্ত্রীকে সমানভাবে দেখতে পারো। কিন্তু আমি প্রশ্ন করি, এমন কোনো মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে কি যে সমানভাবে সকল স্ত্রীকে দেখতে পারে? কোনোদিন পারে না। তাই যদি না পারে তবে চার বিবাহ করতে পারে না। আল্লাহর হুকুম সেখানে অমান্য করা হয়। (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০২০ : ১০০)

বঙ্গবন্ধু মনে করতেন, অন্ধ সংস্কারে জাতির একটা অর্ধেক অংশকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ধর্মের নামে মিথ্যা কথা বলে মা-বোনদের দাসী করে রাখা হয়েছে। (নির্ঝর নৈঃশব্দ, ২০২০ : ৫২) বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, "যদিও আইনে আমাদের দেশে নারী পুরুষের সমান অধিকার, তথাপি আমাদের দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত লোকের মনে এই ধরাণা যে, পুরুষের পায়ের নিচে মেয়েদের বেহেশত। পুরুষ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। মেয়েদের নীরবে সব অন্যায় সহ্য করতে হবে বেহেশতের আশায়।" (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০২০ : ৯৯)

বঙ্গবন্ধু মনে করতেন নারীর উন্নয়নে বা নারীর মুক্তির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো শিক্ষা। তার ভাষ্যে, "নারী শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে, নারী শিক্ষা না হলে দেশের মুক্তি আসতে পারে না।" (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০১৭ :১২৩)

খ. নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন একজন নারী যদি অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হয় তবে সংসারে তার মতামত দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি সমাজেও নারীর অবস্থান সুদৃঢ় হবে। ১৯৫২ সালে নয়াচীন ভ্রমণের সময় তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন নয়াচীনের নারীরা জমি, ফ্যাক্টরি, কল-কারখানা, সৈন্যবাহিনীতে দলে দলে যোগদান করছে। তার ভাষায়:

> আজ নয়াচীনে সমস্ত চাকরিতে মেয়েরা ঢুকে পড়ছে। পুরুষদের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করছে। প্রমাণ করে দিতেছে পুরুষ ও মেয়েদের খোদা সমান শক্তি দিয়েই সৃষ্টি করেছে। সুযোগ পেলে তারাও বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, ডাক্তার, যোদ্ধা সকল কিছুই হতে পারে। ... সত্য কথা বলতে গেলে, একটা জাতির অর্ধেক জনসাধারণ যদি ঘরের কোণে বসে শুধু বংশবৃদ্ধির কাজ ছাড়া আর কোনো কাজ না করে তা হলে সেই জাতি দুনিয়ায় কোনোদিন বড় হতে পারে না। (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০২০ : ৯৯)

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকেও বঙ্গবন্ধু আন্তরিকতার সঙ্গে মূল্যায়ন করেছেন। ভাষা আন্দোলনের সময় জেলে থাকাকালীন তিনি লিখেছেন:

> যে ওয়ার্ডে আমাদের রাখা হয়েছিল, তার নাম চার নম্বর ওয়ার্ড। তিনতলা দালান। দেওয়ালের বাইরেই মুসলিম গার্লস স্কুল। যে পাঁচ দিন আমরা জেলে ছিলাম সকাল দশটায় মেয়েরা স্কুলের ছাদে উঠে স্লোগান দিতে শুরু করত, আর চারটায় শেষ করত। ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা একটু ক্লান্তও হত না। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বন্দি ভাইদের মুক্তি চাই, 'পুলিশি জুলুম চলবে না'- নানা ধরনের স্লোগান। এই সময় শামসুল হক সাহেবকে আমি বললাম, 'হক সাহেব ঐ দেখুন, আমাদের বোনেরা বেরিয়ে এসেছে। আর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করে পারবে না।' (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০১২ : ৯৫)

১৯৪৯ সালে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগে'র খসড়া ম্যানিফেস্টোতেও সর্বক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকারের কথা বলা হয়। উল্লেখ্য যে নতুন এই রাজনৈতিক দল গঠন এবং খসড়া ম্যানিফেস্টো প্রণয়নে দলের প্রতিষ্ঠাকালীন যুগ্ম-সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের সম্পৃক্ততা ছিল। খসড়া ম্যানিফেস্টোর মৌলিক অধিকার শিরোনামে বলা হয়, 'সামাজিক অবস্থা মতামত ও নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে পাকিস্তানের সমগ্র জনসাধারণের ধর্ম্ম সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু জীবনের সমান অধিকার ও সমান সুযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।' (আবুল কাশেম, ২০২১ :২৬) নারীর অধিকার শিরোনামে বলা হয়:

> নারী ও পুরুষের মানসিক ও দৈহিক পার্থক্য সাপেক্ষ জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রতিভা ও শক্তি অনুসারে জীবনে চরম উন্নতি লাভের জন্য প্রত্যেক নারীকে পূর্ণতম সুযোগ ও সুবিধা দিতে হইবে। মাতৃমঙ্গল

> চিকিৎসালয় এবং শিশু সেবা-সদন ও শিশু-শিক্ষালয় (কিন্ডার গার্টেন) মা ও শিশুর খাদ্য ও স্বার্থরক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেক চাকুরিয়া নারীকে সন্তান প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে পূর্ণ বেতনে বিদায় মঞ্জুর করিতে হইবে। (আবুল কাশেম, ২০২১ : ২৮)

সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন, সরকার গঠনে নারী সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি এবং স্থানীয় সরকার কাঠামোতে নারী সদস্য নিয়োগের পক্ষে ছিলেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৫৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি করাচিতে জাতীয় সংসদে ২০টি 'মহিলা আসন' সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিতর্কে বঙ্গবন্ধু পরিষ্কারভাবে তার অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন:

> ... Therefore, Sir, I appeal to them to accept the amendment of my friend Mr. Zahiruddin for the reservation of 20 seats for women in the National Assembly because they are our sisters and they have got every right. They are equal citizens of Pakistan. If we do not provide this safeguard for them it will be difficult for them to compete in open seats with men. If the amendment of Mr. Zahiruddin is accepted then we will be doing a great service to our womenfolk and that will also be better for the development of nation and by that men and women can work together for the emancipation of the country. (মোনায়েম সরকার, ২০০৫ : ১২৫-২৬)

জাতীয় সংসদে প্রস্তাবটি গৃহীত না হলেও বঙ্গবন্ধু পিছপা হননি। বঙ্গবন্ধু ছয় দফা আন্দোলনের সময় গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে আমেনা বেগমকে দলের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। এই সময় আওয়ামী লীগের কোনো কোনো প্রবীণ নেতা আপত্তি তুলেছিলেন। সংগ্রামের চরম মুহূর্তে একজন নারীকে দলের নেতৃত্বভার অর্পণ করলে তা সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না বলে ভেবেছিলেন তারা। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "নারীদেরও পুরুষদের মত সমান অধিকার এবং তা রাজনীতির ক্ষেত্রেও। আওয়ামী লীগ যেমন অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করে তেমনি নর-নারীর সমান অধিকারেও বিশ্বাস করে। আওয়ামী লীগেও নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলা দরকার।" (রাশেদা আতিক রোজী, ২০২০)

১৯৭০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের সাথে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি বৈঠক হয়। বৈঠকে দলীয় শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং জাতীয় পরিষদে ৭টি সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্যদের মনোনয়ন দেয়া হয়। পরবর্তীকালে ১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ৭টি এবং প্রাদেশিক নির্বাচনে ১০টি আসনে মোট ১৭ জন নারী প্রতিনিধি অপ্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭০ সালের জুন মাসে তৎকালীন নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটির সভাপতি পদে বঙ্গবন্ধু নির্বাচিত হন। এই কমিটিতে 'মহিলা সম্পাদিকা' নামে আলাদা একটি পদ সৃষ্টির মাধ্যমে বেগম নূরজাহান মুরশিদকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। (দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ জুন ১৯৭০) বঙ্গবন্ধু সবসময় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে স্বাগত জানিয়েছেন।

২. স্বাধীনতার-উত্তর নারী উন্নয়ন ভাবনা

বঙ্গবন্ধুর এমন চিন্তাধারারই প্রতিফলন দেখা যায় স্বাধীন বাংলাদেশে। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বেতার ও টেলিভিশনের ভাষণে তিনি বলেছেন, 'শ্মশান বাংলাকে আমরা সোনার বাংলা করে গড়ে তুলতে চাই। যে বাংলায় আগামী দিনের মায়েরা হাসবে, শিশুরা খেলবে।' (সেলিনা হোসেন, ২০২১) একইদিনে ঢাকার আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয়ে মহিলা ক্রীড়া সংস্থার অনুষ্ঠানে নারীদের উদ্দেশে

ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু। ভাষণের এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'পুরুষের নাম ইতিহাসে লেখা হয়। মহিলার নাম বেশি ইতিহাসে লেখা হয় না।' (নির্ঝর নৈঃশব্দ, ২০২০ : ৫৪) এই বক্তব্যের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু মনে করিয়ে দিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে নারীর যে আত্মত্যাগ তা সচরাচর স্বীকৃতি পায়না এবং এই বাস্তবতা সম্পর্কে তিনি সচেতন। পাশাপাশি নারীর এই সংগ্রাম এবং ত্যাগকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও তিনি স্বীকার করেছেন। তাই বঙ্গবন্ধু বলেছেন:

> আমি আশা করি, ভবিষ্যৎ বংশধর, স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বংশধর ছেলে ও মেয়েরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলবে। যাতে দুনিয়ার সভ্য জগতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। অন্ধ সংস্কারে আমাদের জাতির একটা অর্ধেক অংশকে আমরা ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখেছিলাম। আমরা ধর্মের নামে মিথ্যা কথা বলে আমার মা-বোনদের আমরা দাসী করে রেখেছিলাম। আপনারা নিশ্চিন্তে বিশ্বাস রাখতে পারেন এই স্বাধীন বাংলাদেশের ভাই-বোনদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। (নির্ঝর নৈঃশব্দ, ২০২০: ৫২)

বঙ্গবন্ধুর এই বক্তব্যের মাধ্যমে স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে নারীর অবস্থা এবং স্বাধীন বাংলাদেশে নারীর ভূমিকা ও অধিকার সম্পর্কে তার ভাবনা প্রতিভাত হয়েছে। শুধু সমান অধিকার নয়, দেশ গঠনের ক্ষেত্রেও তিনি নারীদের এগিয়ে আসতে বলেছেন। নারীদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, 'আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে। ছোট বোনেরা, লেখাপড়া শিখো। ... এই বাংলাকে শোষণহীন সমাজ হিসেবে গড়তে হবে। ভাইয়েদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বোনদেরও এগিয়ে আসতে হবে সেই সংগ্রামের জন্য। জাতি গঠনের সংগ্রামে।' (নির্ঝর নৈঃশব্দ, ২০২০ : ৫২-৫৩)

জাতির উন্নয়নে অর্ধেক অবদান যে নারীর এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে নারী ও পুরুষের যৌথ উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই তা বঙ্গবন্ধু স্বীকার করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের পথচলার শুরুতেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, নারীদের পেছনে ফেলে রেখে আধুনিক ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে না। আর সেই জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শিক্ষার, তাই তিনি ছাত্রীদের মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর আত্মকথা, স্মৃতিকথা এবং বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ভাষণ থেকে এটি স্পষ্ট যে তিনি নারীর অগ্রগতির পথে বহুমুখী সমস্যাকে চিহ্নিত করে তা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। এছাড়া তিনি সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে শত প্রতিকূলতার মাঝেও বঙ্গবন্ধু এদেশের নারী সমাজের উন্নয়ন, নারী শিক্ষার বিস্তার, নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাই মাত্র সাড়ে তিন বছর রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও নারী উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষ্যে তিনি যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তাতে নারীর উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নে তার সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতারই বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়।

ক. যুদ্ধ পরবর্তী নারী পুনর্বাসন

মুক্তিযুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ নারী পাকিস্তানি বাহিনীর দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হন। বিজয় দিবসের পর থেকেই নারীরা পারিবারিক ও সামাজিকভাবে হেয় হবার পাশাপাশি নানা মানসিক নির্যাতন এবং অপমানের শিকার হন। বঙ্গবন্ধু এই নারীদের অবস্থা জেনে মর্মাহত হন। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফিরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বক্তৃতায় মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নারীর উপর পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বরতা তুলে ধরে জাতিসংঘের কাছে গণহত্যা ও নারী নির্যাতনের জন্য আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল গঠনের আবেদন জানান। (আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ২০১২ : ২৯৩) ১৮ জানুয়ারি সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বলেন:

> They (Pak Army) proclaim to be Muslims. How the Muslims have killed Muslim girls. We tried to rescue thousands. Many of them are still on our

camps. Their husbands are killed, fathers are killed. In front of the father and mother they have raped daughters; in front of the son they've raped the mother.(আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ও মো. রহমত উল্লাহ, ২০১৩ : ১১৫)

বঙ্গবন্ধু প্রথমেই মনোযোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের দিকে। ১৯৭২ সালের ৭-৮ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত ২ সংখ্যক প্রস্তাবে, "মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে বন্দি অবস্থায় দখলদার সৈন্য ও তাদের এদেশীয় দোসরদের দ্বারা পাশবিক নির্যাতনের শিকার সম্ভ্রম হারানো নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও তাঁদের সম্মানজনক সামাজিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা" বিষয়ে বলা হয়। (হারুন-অর-রশিদ, ২০১৬ : ১৪৯)

দুঃসহ অবস্থা থেকে নারীদের উদ্ধার করার জন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি নারী পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। (মো. মাহবুবর রহমান, ২০২১ : ১০৩-০৪) এ বোর্ডের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিচারপতি কে. এম. সোবহান। সদস্য হিসেবে ছিলেন বদরুন্নেসা আহমেদ, নুরজাহান মুরশিদ, সাজেদা চৌধুরী, মমতাজ বেগম, রাফিয়া আক্তার ডলি, নীলিমা ইব্রাহিম, লিলি চৌধুরী, বাসন্তী গুহঠাকুরতা। (এইচ. টি. ইমাম, ২০১৮: ১২৮) জাতীয় এই বোর্ডের দায়িত্ব ছিল নারীদের পুনর্বাসনে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ এবং মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন। বোর্ডের প্রথম কাজ ছিল মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারী ও শিশুর সঠিক তথ্য আহরণের জন্য জরিপ কার্যক্রম চালানো, তিন থেকে চার মাসের মধ্যে নির্যাতিত নারীদের সবাইকে চিকিৎসাসেবার আওতায় নিয়ে আসা এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। (আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ও এ. টি. এম. যায়েদ হোসেন, ২০১২ : ৩০০) জেলা পর্যায়েও বোর্ডের কার্যালয় স্থাপন করা হয়। সরকারি অর্থায়নে বোর্ডের নিজস্ব ফান্ড তৈরি করা হয়। পাশাপাশি বিদেশি সহযোগিতাও গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি এবং বিদেশি সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সহযোগিতার জন্য বোর্ডকে ক্ষমতায়িত করা হয়। বোর্ডের সদস্যবৃন্দ দেশের বিভিন্ন স্থান সফর করে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের তালিকা তৈরি, তাদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও পুনর্বাসনমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও সেগুলোর বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করেন। পুনর্বাসন বোর্ডের আওতায় দুস্থ নারীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং সেলাইসহ নানা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বোর্ডের উদ্যোগে ঢাকার বেইলি রোডে প্রতিষ্ঠিত হয় উইমেন্স ক্যারিয়ার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। এখানে নারীদের শর্টহ্যান্ড অফিস ব্যবস্থাপনা, টাইপিং প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। (মো. মাহবুবর রহমান, ২০২১: ১০৪) বঙ্গবন্ধু স্বয়ং এসকল কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্বন্ধে নিয়মিত খোঁজখবর রাখতেন।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতনের শিকার নারীদের 'বীরাঙ্গনা' হিসেবে স্বীকৃতি দেন। ঐদিন বঙ্গবন্ধু পাবনা জেলার বসন্তপুর গ্রামে বন্যাদুর্গত এলাকার ভাঙা বাঁধ সংস্কার উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন। মঞ্চে ওঠার পূর্বেই নারী কণ্ঠের কান্না জড়ানো শব্দ শুনলেন। খানিক এগিয়ে দেখলেন কয়েক জন নারী কিছু বলতে চাইছেন। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের শিকার সেসব নারীর আকুতি শুনে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আচ্ছা মা, বিষয়টি বিশেষভাবে আমি দেখব'। পরমুহূর্তে মঞ্চে ওঠে তাৎক্ষণিকভাবে ভাষণের এক জায়গায় বললেন:

> আজ থেকে পাকবাহিনীর দ্বারা নির্যাতিতা মহিলারা সাধারণ মহিলা নয়, তারা এখন থেকে 'বীরাঙ্গনা' খেতাবে ভূষিত। কেননা দেশের জন্যই তাঁরা ইজ্জত দিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে তাদের অবদান কম নয় বরং কয়েক ধাপ উপরে, যা আপনারা সবাই জানেন, বোঝিয়ে বলতে হবে না। তাই তাদের বীরাঙ্গনার মর্যাদা দিতে হবে এবং যথারীতি সম্মান দেখাতে হবে। আর সেই সব স্বামী বা পিতাদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি যে, আপনারাও ধন্য। কেননা এ ধরনের ত্যাগী ও মহৎ স্ত্রীর স্বামী বা পিতা হয়েছেন। তোমরা বীরাঙ্গনা, তোমরা আমাদের মা। (মুনতাসীর মামুন, ২০১২ :২৬৩)

সেদিন থেকে নির্যাতিত নারীরা 'বীরাঙ্গনা' (বীর নারী) উপাধিতে ভূষিত হন। এভাবেই তিনি নারী-পুরুষকে সৈনিক হিসেবে আখ্যয়িত করে স্বাধীন বাংলাদেশে এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু যুবক শ্রেণির কাছে বীরাঙ্গনাদের বিয়ে করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন:

> যুবক ভাইরা আমার যে বোনেরা আমার যে মেয়েরা পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বরের কাছে ধর্ষিত হয়েছে, তারা ইচ্ছা করে ইজ্জত দেয় নাই। তাদের ইজ্জত নষ্ট করা হয়েছে। তারা আমার মা, তারা আমার বোন, তারা আমার কন্যা। তোমাদের যারা আদর্শ নিয়ে যুদ্ধ করেছ তোমাদের কাছে আমার আবেদন যে, ত্যাগ নিয়ে তোমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবং এই মেয়েদের তোমাদের অনেককে বিবাহ করতে হবে। দুনিয়াকে দেখাতে হবে যে, শুধু রক্ত দিতে পারো না। মা-বোনের ইজ্জতের জন্য তোমরা এগিয়ে যেতে পারো। ... তোমরা আমাকে আদর করে মুজিব ভাই বলো, সেই হিসাবে তোমাদের কাছে আমার আবেদন রইল, তোমরা জেলায় জেলায় লিস্ট কোরো কারা এই ধর্ষিত অনাথ কন্যাদের শাদি করতে চাও। তাদের জন্য আমি বন্দোবস্ত করবো যদি আমার সুযোগ হয়। (নির্ঝর নৈঃশব্দ, ২০২০ : ৩৯)

বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে কিছু যুবক বীরাঙ্গনাদের বিয়ে করেছেন। যখন বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়, তখন সামাজিক সংস্কারের ভয়ে অনেক পিতা সন্তানের পরিচয় দিতে ভয় পান। তখন তিনি পিতার নামের স্থানে শেখ মুজিবুর রহমান আর বাড়ির ঠিকানা ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের তার বাড়ির ঠিকানা লিখে দিতে বলেন। এই ঘোষণার পর কারও মনে আর কোনো দ্বিধা ছিল না। এই পরিচয়েই নারীদের বিয়ে হয়। (শেখ হাসিনা, ২০২১) বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব নিজ উদ্যোগে দশ জন বীরাঙ্গনার বিয়ে দিয়েছিলেন।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের ফলে যেসব নারী গর্ভবর্তী হয়েছিলেন তাদের গর্ভপাতকে আইনসম্মত করার জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার ধর্ষিতার জন্য গর্ভপাত আইন প্রণয়ন করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে সকল নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন কেবল তাদের ক্ষেত্রে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এই আইন প্রযোজ্য ছিল। (মুনতাসীর মামুন, ২০১৩: ৪৯) যে সকল নারী স্বেচ্ছায় গর্ভপাত ঘটাতে চান তাদের গর্ভপাতের ব্যবস্থা করা হয়। মিশনারিজ অব চ্যারিটির সিস্টার মার্গারেট মেরি, আইপিপিএফ-এর ডা. জিওফ্রে ডেভিস এবং ওডার্ট ফন শুলজ এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ডা. ডেভিস ঢাকায় বিভিন্ন হাসপাতালে এবং ক্লিনিকে ছয় মাসে প্রায় প্রতিদিন ১০০ জন নারীর গর্ভপাত ঘটান। (আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ও এ. টি. এম. যায়েদ হোসেন, ২০১২: ৩০০) তবে গর্ভকালীন জটিলতার কারণে ধর্ষণের শিকার অনেক নারীর ক্ষেত্রেই সেই বিশেষ সময়ে গর্ভপাত আইনের প্রয়োগ করা যায়নি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেককে সন্তানের জন্ম দিতে হয়েছে। অনেকের ক্ষেত্রে সন্তান প্রসবের সময় নিকটবর্তী হয়ে যাওয়ার কারণে গর্ভপাত সম্ভব হয়নি। মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে নির্যাতনের শিকার নারীরা বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। বঙ্গবন্ধু বিদেশ থেকে ডাক্তার এনে তাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, শ্রম, সমাজকল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই নারীদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি সরকারি এক বিবৃতিতে বলা হয়, সকল সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা নারীদের জন্য সব রকমের চিকিৎসার সুযোগ প্রদান করবেন। নারীদের সরাসরি অথবা তৎকালীন সমাজকল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা সংস্থাসমূহের মাধ্যমে নিকটবর্তী হাসপাতালসমূহে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। (দৈনিক বাংলা, ১৯ জানুয়ারি ১৯৭২) এছাড়া নির্যাতিত নারী, মা ও শিশুদের চিকিৎসার জন্য সারাদেশে ২২টি সেবা সনদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেখানে নির্যাতিত নারীরা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা পেতেন। পিজি হাসপাতালে আলাদা মহিলা ওয়ার্ড চালু করা হয়। (দৈনিক পূর্বদেশ, ৯ অক্টোবর ১৯৭২) অনেক নারীকে সরকারি উদ্যোগে চিকিৎসা সেবামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং নার্স পেশায় আসতেও উৎসাহিত করা হয়।

খ. ১৯৭২ সালের সংবিধানে নারী অধিকার

১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় রচিত হয় বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা জাতীয় এই চার মূলনীতির উপর ভিত্তি করে শাসনতন্ত্র রচনার বিষয়ে আপসহীন ছিলেন বঙ্গবন্ধু। ড. কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে সংবিধান প্রণয়ন কমিটির একমাত্র নারী সদস্য ছিলেন রাজিয়া বানু। নতুন এ সংবিধানে বঙ্গবন্ধু নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংবিধানে নারীর মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছিল। সংবিধানের বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে নারীর অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি সংক্রান্ত ১৭ সংখ্যক অনুচ্ছেদের (ক) ভাগে বলা হয়েছে, 'একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। একই অধ্যায়ের ১৯ সংখ্যক অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। ১৯(১) এ বলা হয়েছে, 'সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।' পাশাপাশি ১৯(২) এ বলা হয়, 'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। একই অধ্যায়ের ২০ সংখ্যক অনুচ্ছেদে যোগ্যতাবলে কর্মসংস্থানের সমান সুযোগ প্রাপ্তি সম্পর্কে বলা হয়। ২০(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়; এবং প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেক স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।'

সংবিধানের তৃতীয় ভাগে রয়েছে মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ। এই ভাগের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে নারী পুরুষের সম অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২৭ সংখ্যক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী।' বৈষম্য দূরীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে ২৮(১) এ বলা হয়, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।' ২৮(২) সংখ্যক অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী, পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন। ২৮(৩) এ বলা হয়, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।'

অনগ্রসর নারী সমাজের অগ্রগতির জন্য ২৮(৪) সংখ্যক ধারায় বলা হয়, 'নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।' এছাড়া সংবিধানে কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ সৃষ্টির কথা বলা হয়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯(১)-এ বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।' ২৯(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।' পাশাপাশি ২৯(৩) গ তে বলা হয়েছে, 'যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।' এছাড়াও সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে নারীর জন্য জাতীয় সংসদে পনেরটি সংরক্ষিত আসন বরাদ্দ রাখা হয়। সংবিধানের পঞ্চম

ভাগ 'আইনসভা'র **১**ম পরিচ্ছেদ 'সংসদ' এর ৬৫ (৩) সংখ্যক অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'এই সংবিধান প্রবর্তন হইতে দশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত পনরটি আসন কেবল মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন; তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।'

উক্ত অনুচ্ছেদগুলোতে নারীর উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা লক্ষ করা যায়। **১৯৭২** সালের সংবিধানে সর্বস্তরের নারীর অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা বিধান, শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টি, যোগ্যতাবলে কর্মসংস্থানের সমান সুযোগ প্রাপ্তি, জাতীয় সংসদে নারী আসন সংরক্ষণ এই সকল কিছুর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের নারীদের নতুন অগ্রযাত্রার সূচনা করতে চেয়েছিলেন।

গ. প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮)

নারী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর ভাবনার অনেকটাই প্রকাশিত হয়েছে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়। এই পরিকল্পনায় নারীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বিশেষ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ও সমাজ কল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়ঃ

> Investment in the education of women provides a wide range of private and social benefits. ... An effective participation of women in the development of the country can be ensured only by putting them to suitable productive work. Women of our society must acquire a sense of equality with men which can be promoted by providing equal opportunities, including that of education to men and women alike. (প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : ৪৭৯)

নারীদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচিও গৃহীত হয়। প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, ঋণসুবিধা প্রদান করে মাঝারি ও কুটির শিল্পে নারী উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করা হয়। এছাড়া এই পরিকল্পনায় নারীদের অর্থনৈতিক কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম আন্তঃখাত বরাদ্দ উদ্যোগ গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো প্রশাসনের নীতিনির্ধারণী বিভিন্ন পদে যোগ্য নারীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ।

বঙ্গবন্ধু প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের বিষয়টি বিশেষভাবে প্রাধান্য দেন। তাদের জন্য অন্যান্য উদ্যোগের পাশাপাশি বেশ কিছু সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনায় গৃহীত বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক পদক্ষেপের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, 'To arrange rehabilitation of the victims of Pakistan Army of occupation and other natural disasters like cyclone, tornado and land erosion etc' (ঐঃ ৫৩০)

পাশাপাশি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিভিন্ন কর্মকৌশলেও নারীদের অগ্রাধিকার দেখা যায়। বলা হয়, 'The destitute women and children need urgent and massive help for their social and Economic rehabilitation.' (ঐঃ ৫৩১)

পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধী নারীদের বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীসহ অন্যান্য অসহায় নারীদের সাবিক পুর্নবাসনের লক্ষ্যে সরকার ২৫.৪৭৩৬ কোটি অর্থ বরাদ্দ দেয়। ইতোমধ্যে **১৯৭২-৭৩** অর্থবছরে প্রায় ৪০টি ইউনিট নারীদের বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম

চালিয়ে যাচ্ছিল। এই পরিকল্পনায় (১৯৭৭-৭৮) অর্থবছরে তা আরও ২২টি বৃদ্ধি করে সর্বমোট ৬২টি ইউনিট করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। (ঐ: ৫৩২-৩৩)

বঙ্গবন্ধুর কল্যাণে নবগঠিত রাষ্ট্রে নারীর জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল। নির্যাতনের শিকার নারী এবং স্থায়ী বা পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়েছেন এমন নারীরা একটি বিশেষ শ্রেণি হিসেবে এই পরিকল্পনার আওতায় এসেছিলেন। এ পরিকল্পনার মধ্য দিয়েই নারীর পুনর্বাসন থেকে প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান থেকে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে এই বিষয়টি নারী উন্নয়নে প্রভাব বিস্তার করেছে।

ঘ. নারীবান্ধব বিভিন্ন আইন প্রণয়ন

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে নারীবান্ধব বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়েছিল। ১৯৭২ সালে প্রণীত মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট অর্ডার এবং বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা অর্ডার নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট অর্ডারের আওতায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও যুদ্ধাহত নারী মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ ও যুদ্ধাহত পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবার সমূহের জন্য আর্থিক সহায়তা করার পরিকল্পনা করা হয়। তাছাড়া শিল্পঋণ সংস্থা অর্ডারের আওতায় গ্রামীণ নারী, বিধবা, বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধে নির্যাতনের শিকার নারীদের নানা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে প্রণীত হয় The Bangladesh Girl Guides Association Act, 1973 (Act. No. XXXI of 1973) (মো. মাহবুবর রহমান, ২০২১ : ১০৬) এই আইনের অধীনে বাংলাদেশ গার্ল গাইড জাতীয় সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এটি মেয়েদের শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানরূপে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়। এছাড়া বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি The Bangladesh collaborators (special tribunal) order, 1972 শিরোনামে আইন প্রণয়ন করে যা মূলত ১৯৭২-এর দালাল আইন বলে অধিক পরিচিত। পরবর্তীকালে নানা সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে আইনটির তিন দফা সংশোধনীসহ ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973 প্রণিত হয়। এটিই প্রথম লিখিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন, যেখানে নারীর বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতা বা ধর্ষণকে আইনের অধীনে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। (The International Crimes (Tribunals) Act, 1973)

এছাড়াও বঙ্গবন্ধু সরকার পারিবারিক জীবনে নারীর অধিকার রক্ষা ও মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট হয়। ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন এবং ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ আইনের সমন্বয়ে ১৯৭৪ সালে মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন ১৯৭৪ প্রণিত হয়। এই আইনে প্রতিটি বিয়ে সরকার নির্ধারিত রেজিস্ট্রার দ্বারা রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক করা হয়। কারণ রেজিস্ট্রেশন বিয়ের প্রামাণ্য দলিল হিসাবে সাক্ষ্যগত মূল্য বহন করে। এছাড়া রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত নারীরা আইনগত অধিকার থেকেও বঞ্চিত হতে পারে। রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে আইনে প্রদত্ত সকল সুরক্ষাসহ নারীদের অধিকার রক্ষিত হয়।

ঙ. নারী শিক্ষা

রাষ্ট্রভার গ্রহণের কিছুদিনের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু নারী শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে সরকারিভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে নারীদের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিহার্য। নারী শিক্ষা প্রসারের পদক্ষেপ হিসাবে ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রীদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা চালু করা হয়। (মোনায়েম সরকার, ২০০৮: ৬৪৯) বঙ্গবন্ধু সরকার শিক্ষাব্যবস্থা গণমুখী এবং সার্বজনীন করার লক্ষ্যে বিনামূল্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে

পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৭৩ সালে সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় ৭৮ লাখ বই বিনামূল্যে বিতরণের সিদ্ধান্ত জানানো হয়। বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের জন্য শিক্ষাকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য এই পরিকল্পনায় কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। বলা হয়ঃ

ক. প্রাথমিক স্কুলগুলোতে যোগ্যতার ভিত্তিতে নারী শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা। তবে প্রাথমিকভাবে তুলনামূলক কম যোগ্যতা সম্পন্ন নারী শিক্ষকদের নিম্ন শ্রেণিগুলোতে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

খ. যেসকল মেয়েরা বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বঞ্চিত তাদেরকে পার্টটাইম শিক্ষা প্রদান করার জন্য গ্রামীণ শিক্ষিত নারীদের প্রণোদিত করতে হবে। তাদেরকে সেলাই, রান্না, খাদ্য সংরক্ষণসহ গৃহস্থালি কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত বিষয় জানা দরকার তা শিক্ষা দেওয়া হবে। এই সম্পর্কিত সকল নির্দেশনা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির (বার্ড) একটি কমিটির মাধ্যমে প্রদান করা হবে। স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠন এই শিক্ষার সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে।

গ. নারীদের কেবল গৃহস্থালি সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণে আবদ্ধ না থেকে বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কারিগরি এবং টেকনিক্যাল বিষয়গুলোতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। এই সকল ক্ষেত্রে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ তাদেরকে জাতীয় অর্থনীতিতে সম্পৃক্ত করবে।

ঘ. নারী সংগঠনসমূহ, গ্রাম ও শহরের কমিউনিটি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য সামাজিক ও মানবসেবী কর্মীবৃন্দের তরফ থেকে দেশে নারী শিক্ষা ত্বরান্বিত করার জন্য সহযোগিতা প্রত্যাশা করা হয়। (প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : ৪৭৯-৮০)

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২৪,৬০০ নারী শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্য ধায্য করা হয়। এছাড়াও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষা গ্রহণকে সকল নাগরিকের অধিকার হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু সবসময় নারীর উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নারীর শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই ১৯৭৪ সালে প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন (কুদরত-এ খুদা শিক্ষা কমিশন) প্রদত্ত রিপোর্টে নারী শিক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া হয়। রিপোর্টে নারীদের নিয়মিত শিক্ষার পাশাপাশি গার্হস্থ্য জীবনের সহায়ক শিক্ষাদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিশু পালন, খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, রোগীর সেবা ইত্যাদি বিষয় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণের সুপারিশ করা হয়। নারীদের কারিগরি শিক্ষা প্রদান এবং কারিগরি কাজে অভিজ্ঞ করে তোলার ব্যাপারেও গুরুত্ব দেয়া হয়।

১৯৬১ ও ১৯৭৪ সালের আদমশুমারির তুলনামূলক পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় এই সময়ে পুরুষদের সাক্ষরতার হার শতকরা ০.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেলেও নারী স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৪.১ ভাগ। নারী শিক্ষা প্রসারের বঙ্গবন্ধু সরকারের গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপের ফলে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়।

চ. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর সকল ধরনের ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পক্ষে ছিলেন। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রশ্নেও তিনি সোচ্চার ছিলেন। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে প্রথম রচিত সংবিধানের ৬৫ (৩) সংখ্যক অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। ১৯৭৩ সালে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ছিল ১৫টি। এছাড়া সাধারণ আসনে নির্বাচনে অংশগ্রহণেও নারীদের কোনো বাধা ছিল না। জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে